ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

শ্লোক ১-৩

মৈত্রেয় উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্ ।
আত্মনা বর্ধিতাশেষস্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥
জগতস্তস্থুষশ্চাপি বৃত্তিদো ধর্মভৃৎসতাম্ ।
নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥ ২ ॥
আত্মজেষ্বাত্মজাং ন্যস্য বিরহাদ্রুদতীমিব ।
প্রজাসু বিমনঃস্বেকঃ সদারোঽগাত্তপোবনম্ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্মানম্**—দেহে; **প্রবয়সম্**—বার্ধক্য; **একদা**—একসময়; **বৈণ্যঃ**—মহারাজ পৃথু; **আত্ম-বান্**—পারমার্থিক শিক্ষায় পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **বর্ধিত**—বর্ধিত; **অশেষ**—অন্তহীনভাবে; **স্ব-অনুসর্গঃ**—জড় ঐশ্বর্যের সৃষ্টি; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাদের রক্ষক; **জগতঃ**—জঙ্গম; **তস্থুষঃ**—স্থাবর; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বৃত্তি-দঃ**—ভাতা প্রদানকারী; **ধর্ম-ভৃৎ**—ধর্মের অনুশাসন পালনকারী; **সতাম্**—ভক্তদের; **নিষ্পাদিত**—সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করে; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আদেশঃ**—আজ্ঞা; **যৎ-অর্থম্**—তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে; **ইহ**—এই জগতে; **জজ্ঞিবান্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **আত্ম-জেষু**—তাঁর পুত্রদের; **আত্ম-জাম্**—পৃথিবী; **ন্যস্য**—সূচিত করে; **বিরহাৎ**—বিরহের ফলে; **রুদতীম্ ইব**—যেন ক্রন্দন করতে লাগলেন; **প্রজাসু**—প্রজাদের; **বিমনঃসু**—দুঃখিতদের; **একঃ**—একলা; **স-দারঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **তপঃ-বনম্**—যে বনে তপস্যা করা যায়।

অনুবাদ

তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থায়, পৃথু মহারাজ যখন দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ, যিনি সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি স্থাবর

ও জঙ্গম তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত জীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সকলের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তাঁর পূর্ণ অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রদের হস্তে তাঁর কন্যাসদৃশা পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ তাঁর বিরহে কাতর ও ক্রন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীসহ একাকী বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তাই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবানের আদেশ পূর্ণ করার জন্য। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর, এবং তিনি দেখতে চান যে, প্রতিটি গ্রহলোকেই জীবেরা তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সুখে জীবন যাপন করছে। যখনই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তখন ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* ।

বেণ রাজার রাজত্বকালে নানা প্রকার ধর্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল বলে, ভগবান তাঁর সব চাইতে বিশ্বস্ত ভক্ত পৃথু মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য। তাই, ভগবানের আদেশ অনুসারে পৃথিবীর পরিস্থিতি সংশোধন করার পর, পৃথু মহারাজ অবসর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যশাসনে তিনি ছিলেন আদর্শ, এবং এখন অবসর গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন। তিনি পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি বণ্টন করে তাঁদের পৃথিবী শাসন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার পর তিনি তাঁর পত্নীসহ বনে গমন করেছিলেন। এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথু মহারাজ একলা বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৈদিক নিয়ম অনুসারে কেউ যখন গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ পতি ও পত্নীকে একই অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয় । এইভাবে তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে মুক্তিলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে আদর্শ মহাজন পৃথু মহারাজের অনুসৃত পন্থা, এবং এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার পন্থা। মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে না থেকে, উপযুক্ত সময়ে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার

জন্য প্রত্যেকের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে, বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে আগত পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বতোভাবে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, তিনি তপোবনে কঠোর তপস্যাও করেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, তখনকার দিনে বহু তপোবন বা অবসর গ্রহণ করে তপস্যা করার জন্য বিশেষ বন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য, সকলের পক্ষেই তপোবনে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ পারিবারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে গৃহে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৪

তত্রাপ্যদাভ্যনিয়মো বৈখানসসুসম্মতে ।
আরব্ধ উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—ও; **অদাভ্য**—কঠোর; **নিয়মঃ**—তপস্যা; **বৈখানস**—বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম; **সু-সম্মতে**—সুবিদিত; **আরব্ধঃ**—শুরু করে; **উগ্র**—কঠোর; **তপসি**—তপস্যা; **যথা**—যেমন; **স্ব-বিজয়ে**—পৃথিবী জয় করে; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ব্যাপারে যে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, এই ব্যাপারেও তিনি সেই ঐকান্তিকতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-আশ্রমে মানুষের যেমন অত্যন্ত সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তেমনই গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা প্রয়োজন। মানুষ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখনই তা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে মানুষকে সাহায্য করা। গৃহস্থ-আশ্রম হচ্ছে এক প্রকার নিয়মিত জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের

অনুমোদন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থায় চিরতরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা পরিত্যাগ করার জন্য, সম্পূর্ণরূপে তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হওয়া। তাই বানপ্রস্থ-জীবন বা তপস্যার জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ জীবনের সমস্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, যাকে সাধারণত *বৈখানস-আশ্রম* বলা হয়। *বৈখানস-সুসম্মতে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বানপ্রস্থ-আশ্রমে সমস্ত বিধিগুলি কঠোরতার সঙ্গে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিলেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। এইভাবে পৃথু মহারাজের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করার ফলে, গৃহস্থ-আশ্রমে অথবা বিরক্ত-আশ্রমে সর্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ করা যায়। তার ফলে দেহত্যাগ করার পর, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৫

কন্দমূলফলাহারঃ শুষ্কপর্ণাশনঃ ক্বচিৎ ।
অত্তক্ষঃ কতিচিৎপক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্ ॥ ৫ ॥

কন্দ—বৃক্ষের স্কন্দ; **মূল**—শিকড়, **ফল**—ফল; **আহারঃ**—আহার করে; **শুষ্ক**—শুকনো; **পর্ণ**—পাতা; **অশনঃ**—আহার করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অপ্-ভক্ষঃ**—জল পান করে; **কতিচিৎ**—কয়েক; **পক্ষান্**—পক্ষ; **বায়ু**—বায়ু; **ভক্ষঃ**—শ্বাস নিয়ে; **ততঃ পরম্**—তার পর।

অনুবাদ

তপোবনে, পৃথু মহারাজ কখনও কন্দমূল, ফল, কখনও শুষ্ক পত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। অবশেষে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যোগীদের বনে নির্জন স্থানে গিয়ে, পবিত্র স্থানে একাকী বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথু মহারাজের আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন শহর থেকে কোন ভক্ত বা শিষ্য প্রেরিত পক্ক

অন্ন তিনি আহার করেননি। বনবাসের ব্রত গ্রহণ করা মাত্রই, মূল, স্কন্দ, ফল, শুষ্কপত্র অথবা প্রকৃতির দানস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাই কেবল আহার করতে হয়। পৃথু মহারাজ বনে বাস করার জন্য, এই সমস্ত নিয়মগুলি কঠোরতাপূর্বক অঙ্গীকার করেছিলেন, এবং কখনও কখনও তিনি কেবল শুষ্কপত্র আহার করেছিলেন এবং অল্প একটু জল পান করেছিলেন। কখনও তিনি কেবল গাছের ফল আহার করে জীবন ধারণ করেছিলেন, এবং অবশেষে তিনি কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি বনে বাস করেছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করেছিলেন, বিশেষ করে আহারের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের পক্ষে অত্যধিক আহার করা কখনও উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী সাবধান করে দিয়েছেন যে, অত্যধিক আহার এবং অত্যধিক প্রয়াস পারমার্থিক জীবনে উন্নতি-সাধনের পক্ষে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ।

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাস করা রাজসিক, এবং বেশ্যালয় অথবা মদিরালয়ে বাস করা তামসিক। কিন্তু মন্দিরে বাস করা বৈকুণ্ঠে বাস করারই সামিল, যা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ভগবানের মন্দিরে বাস করার সুযোগ দিচ্ছে, যা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ থেকে অভিন্ন। তাই কৃষ্ণভক্তকে বনে যেতে হয় না এবং কৃত্রিমভাবে পৃথু মহারাজ অথবা বনবাসী মুনি-ঋষিদের অনুকরণ করতে হয় না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী মন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং পৃথু মহারাজের মতো একটি গাছের নীচে বাস করেছিলেন। তখন থেকে অনেকে রূপ গোস্বামীর অনুকরণ করে বৃন্দাবনে বাস করতে গিয়েছে। কিন্তু পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে, তাদের অনেকেই অধঃপতিত হয়েছে, এবং বৃন্দাবন ধামে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসব-পানের শিকার হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষদের পক্ষে পৃথু মহারাজ ও রূপ গোস্বামীর মতো বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষেরা অথবা যে-কোন মানুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন্দিরে বাস করতে পারেন, যা বনবাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং অন্য কোন কিছু গ্রহণ না করে, কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের ব্রত অবলম্বন করতে পারেন, এবং চারটি বিধিনিষেধ পালন করে প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন। এইভাবে আচরণ করলে, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও বিচলিত হবে না।

শ্লোক ৬

গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাস্বাসারষাণ্মুনিঃ ।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৬ ॥

গ্রীষ্মে—গ্রীষ্মকালে; **পঞ্চ-তপাঃ**—পাঁচ প্রকার তাপ; **বীরঃ**—নায়ক; **বর্ষাসু**—বর্ষা ঋতুতে; **আসারষাট্**—প্রবল বারিবর্ষণে অবস্থিত থেকে; **মুনিঃ**—মুনিদের মতো; **আকণ্ঠ**—গলা পর্যন্ত; **মগ্নঃ**—নিমজ্জিত হয়ে; **শিশিরে**—শীতকালে; **উদকে**—জলের মধ্যে; **স্থণ্ডিলে-শয়ঃ**—ভূমিতে শয়ন করে।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম এবং মহান ঋষি ও মুনিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথু মহারাজ গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করেছিলেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থেকে বর্ষার ধারাসম্পাত সহ্য করেছিলেন, এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন থেকেছিলেন। তিনি ভূমিতেও শয়ন করতেন।

তাৎপর্য

যারা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, সেই প্রকার জ্ঞানী ও যোগীরা এইভাবে তপস্যা করেন। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে হয়। *পঞ্চতপাঃ* হচ্ছে পাঁচ প্রকার তাপ। চারদিকে চারটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ঊর্ধ্বদিকে সূর্য, এবং তার মাঝখানে বসে এই পঞ্চবিধ তাপ সহ্য করা হয়। এটি একপ্রকার অনুমোদিত তপশ্চর্যা। তেমনই, বর্ষাকালে বর্ষার ধারায় নিজেকে উন্মুক্ত রাখা এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন হয়ে থাকা এক প্রকার তপস্যা। ভূমিতে শয়ন করাও তপস্বীদের কর্তব্য। এই প্রকার কঠোর তপস্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

তিতিক্ষুর্যতবাগ্‌দান্ত ঊর্ধ্বরেতা জিতানিলঃ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরত্তপ উত্তমম্ ॥ ৭ ॥

তিতিক্ষুঃ—সহ্য করে; **যত**—সংযত করে; **বাক্**—বাণী; **দান্তঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম করে; **ঊর্ধ্ব-রেতাঃ**—বীর্য ধারণ করে ; **জিত-অনিলঃ**—প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে; **আরিরাধয়িষুঃ**—কেবল ইচ্ছা করে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অচরৎ**—অনুশীলন করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **উত্তমম্**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী সংযত করে জিতেন্দ্রিয়, ঊর্ধ্বরেতা ও জিতশ্বাস হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাৎপর্য

কলিযুগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল নিরন্তর তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত যারা এই সূত্রটি অবলম্বন করতে পারে না, তারা তপশ্চর্যার অন্যান্য পন্থা স্বীকার না করে, এক ধরনের ছদ্ম-ধ্যানের পন্থা অনুশীলন করে। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে যে, হয় পবিত্র হওয়ার জন্য উপরোক্ত কঠোর তপস্যার পন্থা অবলম্বন করতে হবে, নতুবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান, কারণ কলিযুগে এই প্রকার কঠোর তপস্যা করা মোটেই সম্ভব নয়। আমাদের কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহাপুরুষদের অনুসরণ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* লিখেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম-কীর্তনের পরম বিজয় হোক্, যা শুরুতেই হৃদয়কে পবিত্র করে তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। *ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্* । সমস্ত যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা-বিধান হয়ে থাকে, তা হলে এই যুগের জন্য যে ভক্তিযোগের সরল পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, তাই যথেষ্ট। তবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। পৃথু মহারাজ যদিও এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে তাঁর তপস্যা সম্পাদন করেছিলেন, তবুও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান করা।

বহু মূর্খ আছে যারা বলে যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। পৃথু মহারাজ কোটি-কোটি বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন, কারণ পৃথু মহারাজ ছিলেন ধ্রুব মহারাজের বংশধর, যিনি সত্যযুগে ছত্রিশ হাজার বছর

ধরে রাজত্ব করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের আয়ু এক লক্ষ বছর না হলে, কিভাবে তিনি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করতে পারেন? মূল কথাটি হচ্ছে যে, সৃষ্টির আদিতেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা প্রচলিত ছিল এবং তা সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও এই কলিযুগে প্রচলিত রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রহ্মার এই কল্পেই নয়, প্রতিটি কল্পেই প্রকট হন। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রত্যেক কল্পেই হয়। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে। এটি একটি মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যা বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়নি।

এই শ্লোকে *আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণম্ অচরৎ তপ উত্তমম্* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজ কঠোর তপস্যা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্যই। শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময়, বিশেষ করে এই যুগে, যে তিনি তাঁর দিব্য নামের শব্দতরঙ্গে আবির্ভূত হন। *নারদ পঞ্চরাত্রে* সেই কথা বলা হয়েছে, *আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্* । যদি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হয়, তা হলে আর কঠোর তপস্যার কি প্রয়োজন? কারণ লক্ষ্য তো ইতিমধ্যেই লাভ হয়ে গেছে। সব রকম তপস্যা করার পর, যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে না পৌঁছানো যায়, তা হলে সেই তপস্যার কোন মূল্য নেই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সমস্ত তপস্যাই কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র। *শ্রম এব হি কেবলম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮)। তাই বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে না পারার জন্য, আমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের আয়ু অত্যন্ত অল্প, তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, বৈষ্ণব আচার্যদের প্রদত্ত বিধির অনুশীলন করে শান্তিতে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করা। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন।* দিব্য আনন্দময় জীবন লাভের জন্য কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর, শ্রীবৃন্দাবন ধামের পূজা কর, এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদের সেবা কর। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই অত্যন্ত নিরাপদ এবং সহজ। আমাদের কেবল ভগবানের আদেশ পালন করতে হবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। আমাদের কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে, এবং বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে হবে। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব উভয়েরই প্রতিনিধি; তাই শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা হলে, সর্বসিদ্ধি লাভ হবে।

শ্লোক ৮

তেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্মমলাশয়ঃ ।
প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ ॥ ৮ ॥

তেন—এইভাবে তপস্যা করার ফলে; **ক্রম**—ক্রমশ; **অনু**—নিরন্তর; **সিদ্ধেন**—সিদ্ধির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **মল**—কলুষ; **আশয়ঃ**—বাসনা; **প্রাণ-আয়ামৈঃ**—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **সন্**—হয়ে; **নিরুদ্ধ**—নিগৃহীত; **ষট্-বর্গঃ**—মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ; **ছিন্ন-বন্ধনঃ**—সমস্ত বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে।

অনুবাদ

এইভাবে কঠোর তপস্যা করার ফলে, পৃথু মহারাজ ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সকাম কর্মের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করার জন্য তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সকাম কর্মের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রাণায়ামৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হঠ-যোগীরা ও অষ্টাঙ্গ -যোগীরা প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, কিন্তু সাধারণত তাঁরা তার উদ্দেশ্য কি তা জানেন না। প্রাণায়াম বা অষ্টাঙ্গ-যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়কে সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত করা। তথাকথিত যে-সমস্ত যোগীরা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যোগ অনুশীলন করে, তাদের এই সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য কঠোর পরিশ্রম করার জন্য দেহকে সুস্থ ও সবল করা নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ যে-সমস্ত তপস্যা, প্রাণায়াম ও যোগ অভ্যাস করেছিলেন, সেই সবেরই উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। এইভাবে পৃথু মহারাজ যোগীদের জন্যও এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি যা কিছুই করেছিলেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য।

যারা সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত, তাদের মন সর্বদা কলুষিত বাসনার দ্বারা পূর্ণ। সকাম কর্ম হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করার কলুষিত বাসনার প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কলুষিত বাসনার দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ তাকে একের পর এক জড় শরীর ধারণ করতে হয়। তথাকথিত যোগীরা, যাদের যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল দেহটিকে সুস্থ রাখার জন্য যোগ

অনুশীলন করে। এইভাবে তারা সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তার ফলে অন্য আর একটি শরীর ধারণ করার বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। এই প্রকার যোগীদের বিভিন্ন যোনিতে বিচরণ করার থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। এই যুগে আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

পৃথু মহারাজ এই আচরণ করেছিলেন সত্যযুগে। কিন্তু এই যুগে যারা কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, সেই সমস্ত অধঃপতিত জীবাত্মারা এই যোগ অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।* অর্থাৎ, কর্মী, জ্ঞানী, ও যোগীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার স্তরে আসে, ততক্ষণ তাদের তথাকথিত তপস্যা ও যোগের কোনই মূল্য নেই। *নারাধিতঃ* —যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা না করা হয়, তা হলে ধ্যানযোগ অভ্যাস, কর্মযোগের অনুষ্ঠান অথবা জ্ঞানযোগের অনুশীলনের কোন মূল্যই নেই। প্রাণায়ামের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ভগবানের দিব্য নামকীর্তন এবং আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করাও প্রাণায়াম। পূর্ববর্তী শ্লোকে সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা ।
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ॥

কেবলমাত্র বাসুদেবের আরাধনার দ্বারা সকাম কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বাসুদেবের আরাধনা না করে, যোগী ও জ্ঞানীরা কখনই এই প্রকার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২২/৩৯)

এখানে *প্রাণায়াম* শব্দটি অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করেনি। প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার জন্য সুদৃঢ় করা। বর্তমান যুগে, কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করার ফলেই অতি অনায়াসে এই দৃঢ় সংকল্প লাভ করা যায়।

শ্লোক ৯

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎপুরুষর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

সনৎ-কুমারঃ—সনৎকুমার; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **আধ্যাত্মিকম্**—জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি; **পরম্**—চরম; **যোগম্**—যোগ; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **অভজৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **পুরুষ-ঋষভঃ**—নরশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

এইভাবে সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, পৃথু মহারাজ প্রাণায়াম যোগ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। এই শ্লোকে *পুরুষম্ অভজৎ পুরুষর্ষভঃ* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। *পুরুষর্ষভ* শব্দে নরশ্রেষ্ঠ পৃথু মহারাজকে বোঝানো হয়েছে, এবং *পুরুষম্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। অতএব এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। একজন পুরুষ হচ্ছেন পূজ্য এবং অন্যজন হচ্ছেন পূজক। পূজক পুরুষ জীব যখন পরম পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, তখন সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১২) বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত জীবেরা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে পূর্বে বিরাজমান ছিলেন, এবং ভবিষ্যতেও বিরাজমান থাকবেন। তাই দুই পুরুষ, জীব ও পরমেশ্বর ভগবান কখনই তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন না।

প্রকৃতপক্ষে, যিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে, ভক্তের কাছে এই জীবন ও পরবর্তী জীবনের কোন পার্থক্য নেই। এই জীবনে নবীন ভক্ত কিভাবে ভগবানের সেবা করবেন, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের সেই একই প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন।

নব্য ভক্তের ক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে* । ভগবদ্ভক্তি কখনই জাগতিক কার্যকলাপ নয়। যেহেতু তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তরে ক্রিয়া করছেন, তাই ভগবদ্ভক্ত ইতিমধ্যেই মুক্ত। তাই তাঁকে আর *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অন্য কোন রকম যোগ অভ্যাস করতে হয় না। ভক্ত যদি নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি সর্ব অবস্থায় অবিচলিত থেকে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

শ্লোক ১০

ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা ।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

ভগবৎ-ধর্মিণঃ—যিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন; **সাধোঃ**—ভক্তের; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাস সহকারে; **যততঃ**—প্রচেষ্টা করে; **সদা**—সর্বদা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ব্রহ্মণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস; **অনন্য-বিষয়া**—অবিচলিতভাবে স্থিত; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বিধিবিধান পালন করে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের উদয়ে, তিনি অবিচলিত ভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্-ধর্মিণঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ পৃথু যে ধার্মিক বিধি পালন করছিলেন, তা সমস্ত কৃত্রিমতার অতীত ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১/২) শুরুতে বলা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র*—যে-সমস্ত ধর্মের নিয়ম কৃত্রিমতায় পূর্ণ, তা প্রকৃতপক্ষে কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। *ভগবদ্-ধর্মিণঃ* শব্দটির ব্যাখ্যা

করে বীর রাঘব আচার্য বলেছেন *নিবৃত্ত-ধর্মেণঃ,* অর্থাৎ তা জড়-জাগতিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কলুষিত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

কেউ যখন জড়-জাগতিক বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং সকাম কর্ম ও মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কলুষিত না হয়ে, সম্পূর্ণরূপে অনুকূল ভগবৎ সেবায় যুক্ত হন, তাঁর সেই সেবাকে বলা হয় *ভগবদ্-ধর্ম* বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি। এই শ্লোকে *ব্রহ্মণি* শব্দটি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বোঝায় না। নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব, এবং যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, তাই তাদের *ভগবদ্-ধর্মের* অনুগামী বলা যায় না। জড় সুখভোগের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সেই প্রকার কোন বাসনা নেই। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই প্রকৃত *ভগবদ্-ধর্মী।*

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজ কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। *ভগবতি ব্রহ্মণি* কথাটি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তকে বোঝায়। ভক্তের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়, এবং তিনি কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান না। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পৃথু মহারাজ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের পন্থা অবলম্বন না করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্মশুদ্ধ-
সত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্যা ।
জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন
চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর; **অনয়া**—এর দ্বারা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **পরিকর্ম**—ভক্তির কার্য; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ, চিন্ময়; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **আত্মনঃ**—মনের; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুসংস্মরণ**—নিরন্তর স্মরণ; **অনুপূর্ত্যা**—পূর্ণরূপে সম্পাদন করে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান;

বিরক্তি—অনাসক্তি; **মৎ**—সম্পন্ন; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **নিশিতেন**—তীব্র কার্যকলাপের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **চিচ্ছেদ**—বিচ্ছিন্ন হয়েছিল; **সংশয়-পদম্**—সন্দেহের স্থিতি; **নিজ**—নিজের; **জীব-কোশম্**—জীবাত্মার আবরণ।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, পৃথু মহারাজের মন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তায় মগ্ন হতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি অহঙ্কার ও জড়-জাগতিক জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ-পঞ্চরাত্রে ভগবদ্ভক্তিকে একটি রানীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রানী যখন দর্শন দেন, তখন বহু পরিচারিকা তাঁর সঙ্গে থাকেন। ভগবদ্ভক্তিরূপ রানীর পরিচারিকারা হচ্ছেন জড় ঐশ্বর্য, মুক্তি ও যোগসিদ্ধি। কর্মীরা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞানীরা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষী, এবং যোগীরা অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত। *নারদ-পঞ্চরাত্র* থেকে আমরা জানতে পারি যে, যিনি শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি সকাম কর্ম, মনোধর্মী জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা লব্ধ সমস্ত ঐশ্বর্যও আপনা থেকেই লাভ করেছেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই *কৃষ্ণকর্ণামৃতে* প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান! আমি যদি আপনার প্রতি অনন্য ভক্তিলাভ করতে পারি, তা হলে আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে প্রকাশিত হন, এবং তখন সকাম কর্মের ফল, এবং দার্শনিক জ্ঞানের ফল—যথা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আমার সম্মুখে ভৃত্যের মতো দণ্ডায়মান হয়ে, আমার আদেশের প্রতীক্ষা করে।" অর্থাৎ, জ্ঞানীরা *ব্রহ্মবিদ্যা* বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কঠোর প্রয়াস করে, কিন্তু ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভ করে আপনা থেকেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভক্তের চিন্ময় দেহ যখন প্রকাশিত হতে শুরু হয়, তখন তিনি চিন্ময় জীবনের কার্যকলাপে প্রবিষ্ট হন।

বর্তমানে আমাদের শরীর, মন ও বুদ্ধি সবই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হই, তখন আমাদের চিন্ময় দেহ, চিন্ময় মন ও চিন্ময় বুদ্ধি প্রকাশিত হয়। সেই চিন্ময় অবস্থায় ভগবদ্ভক্ত কর্ম, জ্ঞান ও যোগের সমস্ত সুফল লাভ করেন। ভক্ত যদিও কখনও অলৌকিক শক্তিলাভের

জন্য সকাম কর্মে অথবা মনোধর্মী জ্ঞানে প্রবৃত্ত হন না, তবুও তাঁর সেবায় অলৌকিক শক্তি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভগবদ্ভক্ত কখনও কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু সেই সমস্ত ঐশ্বর্য আপনা থেকেই তাঁর কাছে আসে। সেই জন্য তাঁকে কোন প্রয়াস করতে হয় না। তাঁর ভক্তির প্রভাবে, তিনি আপনা থেকেই *ব্রহ্মভূত* হন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণ ভক্তিযোগে, সর্ব অবস্থায় অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।"

নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত জীবনের চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তাই তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া আর অন্য কিছুর কথা চিন্তা করতে পারেন না। এই হচ্ছে *সংস্মরণ-অনুপূর্ত্যা* শব্দটির অর্থ। নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তৎক্ষণাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হন। শুদ্ধসত্ত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের, এমন কি সত্ত্বগুণেরও অতীত চিন্ময় স্তর। এই জড় জগতে সত্ত্বগুণ হচ্ছে পরম সিদ্ধির সূচক, কিন্তু এই গুণকেও অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে আসতে হয়, যেখানে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ ক্রিয়া করতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন— যার পচনশক্তি প্রবল, আহার করার পর আপনা থেকেই তার উদরে জঠরাগ্নি জ্বলে ওঠে, যা সব কিছু হজম করিয়ে দেয়, এবং তাকে আর হজম করার জন্য কোন রকম ঔষধ গ্রহণ করতে হয় না। তেমনই, ভগবদ্ভক্তির আগুন এতই প্রবল যে, তাকে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য অথবা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য, পৃথকভাবে আর কিছু করতে হয় না। জ্ঞানীকে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানের চর্চা করতে হতে পারে, কিন্তু অবশেষে ব্রহ্মভূত স্তরে আসতে পারে, কিন্তু ভক্তকে এই ধরনের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীরা সর্বদা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান; তাই তারা ভ্রান্তভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগাবনের নিত্যদাস। ভক্তিবিহীন জ্ঞানী ও যোগীরা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তাদের বুদ্ধি ভক্তের মতো শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ, জ্ঞানী ও যোগীরা ভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারে না।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

জ্ঞানী ও যোগীরা ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তির অভাবের ফলে, তাদের পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। তাই জ্ঞান ও যোগকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে পৃথু মহারাজ আপনা থেকেই এই সমস্ত পদ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাই মুক্তিলাভের জন্য তাঁর করণীয় কিছু ছিল না। তিনি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বৈকুণ্ঠলোক বা চিজ্জগৎ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই জ্ঞান, যোগ অথবা কর্মের পন্থা অনুশীলন না করেই, তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই স্থির ছিল। যদিও পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণ যাতে জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদন করে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, সেই পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্ত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন ।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ॥ ১২ ॥

ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **অন্য-ধীঃ**—জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা (দেহাত্মবুদ্ধি); **অধিগত**—গভীরভাবে অবগত হয়ে; **আত্ম-গতিঃ**—পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য; **নিরীহঃ**—বাসনারহিত; **তৎ**—তা; **তত্যজে**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ছিন্ন করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **বয়ুনেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ন**—কখনই না; **যোগ-গতিভিঃ**—যৌগিক পন্থার অনুশীলন; **যতিঃ**—অনুশীলনকারী; **অপ্রমত্তঃ**—মোহমুক্ত; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **গদাগ্রজ**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথাসু**—বাণী; **রতিম্**—আকর্ষণ; **ন**—কখনই না; **কুর্যাৎ**—কর।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ যখন সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। এইভাবে পরমাত্মার কাছ থেকে সমস্ত আদেশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে, তিনি যোগ ও জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কি জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিতেও তাঁর কোন রুচি ছিল না, কারণ তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং যোগী ও জ্ঞানীরা যদি কৃষ্ণকথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সংসার সম্বন্ধে তাদের ভ্রম কখনও দূর হবে না।

তাৎপর্য

মানুষ যতক্ষণ দেহাত্ম-চেতনায় অত্যন্ত মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে অষ্টাঙ্গযোগ অথবা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থার প্রতি আগ্রহী হয়। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং তাই যারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী, তাদের সে তখন সাহায্য করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের পূর্ণতা নির্ভর করে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার প্রবণতার উপর। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে—*যাবদ্‌গদাগ্রজকথাসু রতিং না কুর্যাৎ।* মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং তাঁর লীলা ও কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত না হয়, ততক্ষণ যোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করে পৃথু মহারাজ জ্ঞান ও যোগ অভ্যাসের প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন এবং সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে রূপ গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে শুদ্ধ ভক্তির স্তর—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে, জীব যে ভগবানের নিত্যদাস তা হৃদয়ঙ্গম করা। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, এই জ্ঞান লাভ হয়। যে-কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* জীবনের পরমহংস স্তরে মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।* কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু এবং কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি,

তখন তিনি পরমহংস বা মহাত্মা হন। এই প্রকার মহাত্মা বা পরমহংস অত্যন্ত দুর্লভ। পরমহংস বা শুদ্ধ ভক্ত কখনও হঠযোগ বা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের অনন্য ভক্তিতেই আগ্রহশীল। পূর্বে যারা এই সমস্ত পন্থার প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও জ্ঞান ও যোগেরও অভ্যাস করে থাকে, কিন্তু অনন্য ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই, তারা আত্ম-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন চরম লক্ষ্য, তখন তিনি আর হঠযোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ১৩

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ।
ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **বীর-প্রবরঃ**—বীরশ্রেষ্ঠ; **সংযোজ্য**—প্রয়োগ করে; **আত্মানম্**—মন; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ব্রহ্ম-ভূতঃ**—মুক্ত হয়ে; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **কালে**—যথাসময়ে; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **স্বম্**—নিজের; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

তারপর যখন পৃথু মহারাজের দেহত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হয়ে, তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে যে, পারমার্থিক উন্নতির চরম পরীক্ষা হয় মৃত্যুর সময়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৮/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছেন, তাঁরা জানেন যে, তাঁদের পরীক্ষা হবে মৃত্যুর সময়। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ গোলোক

বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলোকে পৌঁছানো যায়, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পৃথু মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবং তাই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যোগের পন্থায় ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হয়ে, দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে স্বেচ্ছায় এই দেহত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। মৃত্যুর সময় পৃথু মহারাজ যে যৌগিক পন্থা অনুশীলন করেছিলেন, তা দৈহিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থায়ও দেহত্যাগ করার জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। প্রত্যেক ভক্তই কামনা করেন যে, দৈহিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থায় যেন দেহত্যাগ করা যায়। মহারাজ কুলশেখরও তাঁর *মুকুন্দমালা স্তোত্রে* এই বাসনা ব্যক্ত করেছেন—

কৃষ্ণ তদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

মহারাজ কুলশেখর সুস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন শরীর ও মন সুস্থ থাকাকালে দেহত্যাগ করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কফ, বায়ু ও পিত্তের দ্বারা মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তখন যেহেতু কোন কিছু উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়, তাই কৃষ্ণের কৃপাতেই কেবল মৃত্যুর সময় হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু মুক্তাসনে স্থিত হয়ে যোগী তাঁর দেহত্যাগ করে তাঁর ঈপ্সিত লোকে গমন করতে পারেন। সিদ্ধযোগী যোগ অভ্যাসের দ্বারা, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

সম্পীড্য পায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ঞ্ছনৈঃ ।
নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশীর্ষণি ॥ ১৪ ॥

সম্পীড্য—রোধ করে; **পায়ুম্**—গুহ্যদ্বার; **পার্ষ্ণিভ্যাম্**—গুল্‌ফের দ্বারা; **বায়ুম্**—ঊর্ধ্বগামী বায়ু; **উৎসারয়ন্**—ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নাভ্যাম্**—নাভির দ্বারা; **কোষ্ঠেষু**—হৃদয় ও কণ্ঠে; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **হৃৎ**—হৃদয়ে; **উরঃ**—ঊর্ধ্ব; **কণ্ঠ**—কণ্ঠ; **শীর্ষণি**—ভ্রূযুগলের মধ্যে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ এক বিশেষ যৌগিক আসনে বসে তাঁর পায়ের গোড়ালির দ্বারা গুহ্যদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন, এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রথমে নাভিদেশের চক্রে, তারপর হৃদ্দেশের চক্রে, তারপর কণ্ঠের চক্রে এবং অবশেষে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী চক্রে উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে আসনের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে বলা হয় মুক্তাসন। যোগপদ্ধতিতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের ক্রিয়া কঠোরভাবে বিধিনিষেধ অনুশীলন করার মাধ্যমে সংযত করার পর, যোগ অনুশীলনকারীকে বিভিন্ন প্রকার আসন অভ্যাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করতে সমর্থ হওয়া। যিনি যোগের চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহে বাস করতে পারেন, অথবা দেহত্যাগ করে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে অথবা বাইরে যে-কোন স্থানে যেতে পারেন। কোন কোন যোগী উচ্চতর লোকে গিয়ে জড়সুখ ভোগ করার জন্য দেহত্যাগ করেন। কিন্তু, বুদ্ধিমান যোগীরা এই জড় জগতের মধ্যে সময়ের অপচয় করতে চান না; তাঁরা উচ্চতর লোকে জড়সুখ ভোগের সুযোগ-সুবিধাগুলির প্রতি একটুও আকৃষ্ট নন, পক্ষান্তরে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী।

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, পৃথু মহারাজের উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার কোন বাসনা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ যদিও কৃষ্ণভক্তি লাভের পর, অষ্টাঙ্গ-যোগের অভ্যাস বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবুও শীঘ্রই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভ্যাসের সদ্ব্যবহার করে নিজেকে *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মুক্তাসন নামক এই বিশেষ আসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুণ্ডলিনী-চক্রকে ক্রমে ক্রমে মূলাধার-চক্র থেকে স্বাধিষ্ঠান-চক্রে, তারপর মণিপুর-চক্রে, তারপর অনাহত-চক্রে ও বিশুদ্ধ-চক্রে এব অবশেষে আজ্ঞা-চক্রে উত্তোলন করা। যোগী যখন ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী আজ্ঞা-চক্রে প্রাণবায়ুকে উত্তোলন করতে সক্ষম হন, তখন তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চিৎ-জগতের বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোক পর্যন্ত যে-কোন লোকে যেতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে, ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছাতে হয়। কিন্তু, যাঁরা কৃষ্ণভক্ত বা যাঁরা ভক্তিযোগ *(শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্)* অনুশীলন করছেন, তাঁরা মুক্তাসনের পন্থা অভ্যাস না করেও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে

পারেন। মুক্তাসন অভ্যাস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হওয়া, কারণ *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায় না। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে, ভক্ত সর্বদাই *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত *(ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)* । ভক্ত যদি *ব্রহ্মভূত* স্তরে অবস্থিত থাকতে পারেন, তা হলে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, আপনা থেকেই চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে পারেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই কুণ্ডলিনী-চক্র জাগরিত করার ব্যাপারে অথবা একে একে *ষট্-চক্র* ভেদ করার ব্যাপারে পারঙ্গত না হওয়ার ফলে, ভক্তের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। পৃথু মহারাজ ইতিমধ্যেই এই পন্থা অনুশীলন করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাননি, তাই তিনি *ষট্-চক্র* ভেদ করার এই পন্থার সুযোগ নিয়ে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

উৎসর্পয়ংস্তু তং মূর্ধ্নি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ ।
বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্যযূযুজৎ ॥ ১৫ ॥

উৎসর্পয়ন্—এইভাবে স্থাপন করে; **তু**—কিন্তু; **তম্**—বায়ু; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **ক্রমেণ**—ধীরে ধীরে; **আবেশ্য**—স্থাপন করে; **নিঃস্পৃহঃ**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **বায়ুম্**—দেহের বায়ুভাগ; **বায়ৌ**—ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদনকারী সমগ্র বায়ুতে; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীর সমস্ত আবরণে; **কায়ম্**—তাঁর জড় দেহ; **তেজঃ**—দেহের অগ্নি; **তেজসি**—জড়া প্রকৃতির অগ্নির আবরণে; **অযূযুজৎ**—মিশ্রিত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করেছিলেন। তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বায়ুতে, তাঁর দেহের কঠিন ভাগকে সমগ্র পৃথিবীতে, এবং তাঁর দেহের অগ্নিকে সমগ্র অগ্নিতে লীন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, যার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের একভাগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যখন জড় অস্তিত্বে আসতে বাধ্য হয়, তখন সেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। জড় দেহটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটি স্থূল উপাদানে, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানের দ্বারা গঠিত। কেউ যখন মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি এই জড় আবরণগুলি থেকে মুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে যোগের সাফল্য নির্ভর করে, এই সমস্ত জড় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় অস্তিত্বে প্রবেশ করার উপর। বুদ্ধদেবের নির্বাণের শিক্ষা এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব তাঁর অনুগামীদের ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে এই জড় আবরণগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধদেব আত্মা সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব প্রদান করেননি, কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে, তা হলে সে চরমে জড় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করবে।

জীব যখন জড় আবরণ ত্যাগ করে, তখন সে তার চিন্ময় আত্মায় স্থিত হয়। আত্মাকে অবশ্যই চিদাকাশে প্রবেশ করে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত চিৎ-জগৎ ও বৈকুণ্ঠলোকের তত্ত্ব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তার ৯৯.৯ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার। তবে, ব্রহ্মজ্যোতি থেকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, এই ব্রহ্মজ্যোতি বৈচিত্র্যহীন, এবং বৌদ্ধরা মনে করে যে, তা শূন্য। চিদাকাশকে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করা হোক অথবা শূন্য বলে মনে করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই চিন্ময় আনন্দ নেই, যা বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোকে আস্বাদন করা যায়। বিচিত্র আনন্দের অনুপস্থিতিতে, আত্মা ক্রমশ আনন্দময় জীবন উপভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং কৃষ্ণলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবে জড়-জাগতিক আনন্দ উপভোগ করার জন্য জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১৬

খান্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ ।
ক্ষিতিমম্ভসি তত্তেজস্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ॥ ১৬ ॥

খানি—শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বার; **আকাশে**—আকাশে; **দ্রবম্**—তরল পদার্থ; **তোয়ে**—জলে; **যথা-স্থানম্**—উপযুক্ত স্থানে; **বিভাগশঃ**—যেভাবে বিভাজিত হয়েছে; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **অম্ভসি**—জলে; **তৎ**—সেই; **তেজসি**—আগুনে; **অদঃ**—অগ্নি; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **নভসি**—আকাশে; **অমুম্**—সেই।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে আকাশে, রক্ত আদি দেহের তরল অংশকে সমগ্র জলে লীন করেছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যথাস্থানম্* ও *বিভাগশঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে একের পর এক ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ দেবতাদের, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের, এবং জড় উপাদানের বিভাগ হয়। তিনি এও বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে একের পর এক তাদের সৃষ্টি হয়—আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে মাটি, ইত্যাদি। সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই, ভগবান সেই একই পন্থায় এই জড় দেহও সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়ার পর, ভগবান একে একে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তেমনই, জীব মাতৃজঠরে প্রবেশ করার পর, সমগ্র আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী থেকে উপাদানগুলি সংগ্রহ করে সে তার স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করে। *যথাস্থানং বিভাগশঃ* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ক্রম বিপরীতভাবে বিচার করে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৭

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্ ।
ভূতাদিনামূন্যুৎকৃষ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয়েষু—ইন্দ্রিয়ে; **মনঃ**—মন; **তানি**—ইন্দ্রিয়; **তৎ-মাত্রেষু**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; **যথা-উদ্ভবম্**—যেখান থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে; **ভূত-আদিনা**—পঞ্চ উপাদানের দ্বারা;

অমূনি—সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **উৎকৃষ্য**—বার করে নিয়ে; **মহতি**—মহত্তত্ত্বে; **আত্মনি**—অহঙ্কারকে; **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি স্থিতি অনুসারে, মনকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজন করেছিলেন। তারপর তিনি তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের সম্পর্কে মহত্তত্ত্ব দুইভাগে বিভক্ত হয়—একভাগ তমোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় এবং অপর ভাগটি রজ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। তমোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, পঞ্চ-মহাভূতের সৃষ্টি হয়। রজোগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, মনের সৃষ্টি হয়, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। মন সংরক্ষিত হয় বিশেষ প্রকার দেবতার দ্বারা। মনেরও নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা রয়েছেন। এইভাবে সমগ্র মন, অর্থাৎ জড় দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জড় মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোজিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে যোজিত হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ইত্যাদি। শব্দ হচ্ছে ইন্দ্রিয় বিষয়ের চরম উৎস। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন আকৃষ্ট হয় এবং তন্মাত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়, এবং চরমে তারা সকলে আকাশে সংযোজিত হয়। সৃষ্টির আয়োজন এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে কারণ ও কার্য পরস্পরকে অনুসরণ করে। লীন হওয়ার পন্থা মূল কারণের সঙ্গে কার্যের সংযোজনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। যেহেতু জড় জগতের চরম কারণ হচ্ছে মহত্তত্ত্ব, তাই ধীরে ধীরে সব কিছু মহত্তত্ত্বে সংযোজিত হয়ে লীন হয়। একে শূন্যবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু এটি হচ্ছে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মন অথবা চেতনাকে শুদ্ধ করার পন্থা।

মন যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়, তখন শুদ্ধ চেতনা ক্রিয়া করে। চিদাকাশের শব্দতরঙ্গ আপনা থেকে সমস্ত জড় কলুষ নির্মল করতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*চেতোদর্পণ-মার্জনম্* । মনকে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত করার জন্য, আমাদের কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই কঠিন শ্লোকটির এটি হচ্ছে সারমর্ম। কীর্তনের প্রভাবে যখন সমস্ত জড় কলুষ বিধৌত হয়, তখন সমস্ত কামনা-বাসনা ও জড়-জাগতিক কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়ে

যায়, এবং প্রকৃত জীবনের শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব শুরু হয়। এই শ্লোকে যে যোগপদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা আয়ত্ত করা এই কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন। এই প্রকার যোগে অত্যন্ত সুদক্ষ না হতে পারলে, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত *শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্* অবলম্বন করা। তার ফলে, কেবলমাত্র *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,* এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে অনায়াসে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড়-জাগতিক জীবনের শুরু যেমন জড় শব্দ থেকে হয়, তেমনই, চিন্ময় জীবনের শুরুও চিন্ময় শব্দতরঙ্গ থেকে হয়।

শ্লোক ১৮

তং সর্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ ।
তং চানুশয়মাত্মস্থমসাবনুশয়ী পুমান্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যেণ স্বরূপস্থোঽজহাৎপ্রভুঃ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-গুণ-বিন্যাসম্**—সমস্ত গুণের আধার; **জীবে**—উপাধি সমূহকে; **মায়া-ময়ে**—সমস্ত শক্তির আধার; **ন্যধাৎ**—স্থাপন করে; **তম্**—তা; **চ**—ও; **অনুশয়ম্**—উপাধি; **আত্মস্থম্**—আত্ম-উপলব্ধিতে স্থিত; **অসৌ**—তিনি; **অনুশয়ী**—জীব; **পুমান্**—ভোক্তা; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **বীর্যেণ**—শক্তির দ্বারা; **স্বরূপ-স্থঃ**—স্বরূপে স্থিত হয়ে; **অজহাৎ**—স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **প্রভুঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

তারপর পৃথু মহারাজ জীবাত্মার সম্পূর্ণ উপাধি মায়ার পরম নিয়ন্তাকে অর্পণ করেছিলেন। যে উপাধির দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, সেই সমস্ত উপাধি থেকে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অবস্থিত হয়ে, তিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা প্রভুরূপ তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় শক্তির উৎস। তাই তাঁকে কখনও কখনও *মায়াময়* বা পরম পুরুষ বলা হয়, যিনি মায়া নামক তাঁর

শক্তির মাধ্যমে তাঁর লীলাবিলাস করতে পারেন। ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৩) আমরা জানতে পারি—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে জীব মায়া প্রদত্ত যন্ত্রস্বরূপ বিভিন্ন দেহের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার সুযোগ পায়। যদিও জীব ও ভগবান উভয়েই জড়া প্রকৃতিতে রয়েছেন, তবুও ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করার মাধ্যমে, তার গতিবিধি পরিচালনা করছেন, এবং এইভাবে জীব বিভিন্ন শরীরের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তার কর্মের প্রভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ছে।

পৃথু মহারাজ যখন তাঁর দিব্য জ্ঞানের বিকাশ এবং জড় বাসনা থেকে বিরক্তির প্রভাবে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের প্রভু হয়েছিলেন (সেই অবস্থাকে কখনও কখনও বলা হয় গোস্বামী বা স্বামী)। অর্থাৎ তিনি তখন আর জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হননি। কেউ যখন এত শক্তিশালী হন যে, তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব পরিত্যাগ করতে পারেন, তখন তাঁকে বলা হয় প্রভু। এই শ্লোকে *স্বরূপস্থঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজেকে জানা। সেই জ্ঞানকে বলা হয় *স্বরূপোপলব্ধি*। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত ক্রমশ ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। নিজের বিশুদ্ধ স্থিতি সম্বন্ধে এই উপলব্ধিকে বলা হয় *স্বরূপোপলব্ধি,* এবং কেউ যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে দাস, সখা, পিতামাতা অথবা প্রেমিকারূপে তিনি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় *স্বরূপস্থ*। পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে তাঁর এই স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, বৈকুণ্ঠ থেকে প্রেরিত রথে চড়ে তিনি এই জগৎ বা এই দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

এই শ্লোকে *প্রভু* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন পূর্ণরূপে স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং সেই স্থিতি অনুসারে আচরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় প্রভু। শ্রীগুরুদেবকে 'প্রভুপাদ' বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন পূর্ণরূপে স্বরূপসিদ্ধ আত্মা। *পাদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পদ', এবং *প্রভুপাদ* বলতে বোঝায় যে, তাঁকে প্রভু বা পরমেশ্বর ভগবানের পদ প্রদান করা হয়েছে, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে আচরণ করেন।

প্রভু বা ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা না হলে, গুরুর কার্য করা যায় না এবং গুরুদেব হচ্ছেন পরম প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করে লিখেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানের মতো সম্মান প্রদর্শন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক।" তাই পৃথুমহারাজকেও প্রভুপাদ বা এখানকার বর্ণনা অনুসারে প্রভু বলে সম্বোধন করা যায়। এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তা হলে কেন তাঁকে প্রভু হওয়ার জন্য বিধিবিধান অনুশীলন করতে হয়েছিল? যেহেতু তিনি এই পৃথিবীতে একজন আদর্শ রাজারূপে এসেছিলেন এবং যেহেতু রাজার কর্তব্য হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রজাদের শিক্ষা দেওয়া, তাই তিনি অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্তির সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেছিলেন। তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি একজন ভক্তরূপে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হয়। তাই বলা হয়েছে, *আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের আচরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। তেমনই, পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি প্রভুর পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, ঠিক একজন ভক্তের মতো আচরণ করেছিলেন। অধিকন্তু *স্বরূপস্থঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ মুক্তি'। এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) বলা হয়েছে, *হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*—জীব যখন মায়িক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্তর প্রাপ্ত হন, তাঁর সেই অবস্থাকে বলা হয় স্বরূপস্থঃ অথবা পূর্ণ মুক্তি।

শ্লোক ১৯

অর্চির্নাম মহারাজ্ঞী তৎপত্ন্যনুগতা বনম্ ।
সুকুমার্যতদর্হা চ যৎপদ্ভ্যাং স্পর্শনং ভুবঃ ॥ ১৯ ॥

অর্চিঃ নাম—অর্চি নামক; **মহা-রাজ্ঞী**—মহারাণী; **তৎ-পত্নী**—পৃথু মহারাজের পত্নী; **অনুগতা**—তাঁর পতির অনুগামিনী; **বনম্**—বনে; **সু-কুমারী**—অত্যন্ত কোমলাঙ্গী; **অ-তৎ-অর্হা**—অযোগ্য; **চ**—ও; **যৎ-পদ্ভ্যাম্**—যাঁর পায়ের দ্বারা; **স্পর্শনম্**—স্পর্শ করে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর উপর।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের পত্নী মহারাণী অর্চি ছিলেন অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, তিনি তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। যদিও তাঁর বনে বাস করার প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চরণ-কমলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পৃথু মহারাজের পত্নী ছিলেন একজন মহারাণী এবং একজন রাজার দুহিতা, তাই তিনি কখনও ভূমিতে পদক্ষেপ করেননি, কারণ রাণীরা কখনও প্রাসাদের বাইরে আসতেন না। তাঁরা অবশ্যই বনে যাননি এবং সেখানে বাস করার নানা রকম অসুবিধা সহ্য করেননি। বৈদিক সভ্যতায় পতিব্রতা মহারাণীদের এই প্রকার ত্যাগের শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। রামচন্দ্র যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী সীতাদেবীও তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আদেশ পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু সীতাদেবীর প্রতি এই প্রকার কোন আদেশ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। তেমনই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীও তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। পৃথু, শ্রীরামচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের মতো মহা-পুরুষদের পত্নী হওয়ার ফলে, তাঁরাও ছিলেন আদর্শ সতীসাধ্বী রমণী। এই প্রকার মহারাণীরাও তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে পতিব্রতা হয়ে জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে পতির অনুগমন করতে হয়। পতি যখন রাজা, তখন তিনি তাঁর পাশে মহারাণীরূপে বসেন, এবং পতি যখন বনে গমন করেন, তখনও তিনি তাঁর অনুগমন করেন, তা বনে যত দুঃখ-কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন। তাই এখানে বলা হয়েছে *অতদ্-অর্হা*, অর্থাৎ যদিও তাঁর পদদ্বয় কখনও ভূমি স্পর্শ করেনি, তবুও তিনি যখন তাঁর পতির সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে সব রকম কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অতীব ভর্তুর্ব্রতধর্মনিষ্ঠয়া
শুশ্রূষয়া চার্যদেহযাত্রয়া ।
নাবিন্দতার্তিং পরিকর্শিতাপি সা
প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥ ২০ ॥

অতীব—অত্যন্ত; **ভর্তুঃ**—পতির; **ব্রত-ধর্ম**—তাঁর সেবা করার ব্রত; **নিষ্ঠয়া**—নিষ্ঠা সহকারে; **শুশ্রূষয়া**—সেবার দ্বারা; **চ**—ও; **আর্ষ**—মহান ঋষিদের মতো; **দেহ**—দেহ; **যাত্রয়া**—বসবাসের অবস্থা; **ন**—করেননি; **অবিন্দত**—উপলব্ধি; **আর্তিম্**—কোন প্রকার কষ্ট; **পরিকর্শিতা অপি**—দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও; **সা**—তিনি; **প্রেয়ঃ-কর**—অত্যন্ত সুখদায়ক; **স্পর্শন**—স্পর্শ; **মান**—যুক্ত; **নির্বৃতিঃ**—আনন্দ।

অনুবাদ

মহারাণী অর্চি যদিও এই প্রকার কষ্টে অভ্যস্ত ছিলেন না, তবুও তিনি মহর্ষির মতো বনবাসী তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কেবল ফল, ফুল ও পাতা ভক্ষণ করতেন, এবং যেহেতু তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে তাঁর কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি হত না।

তাৎপর্য

ভর্তুর্ব্রত-ধর্ম-নিষ্ঠয়া বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে, স্ত্রীর কর্তব্য বা ধর্ম হচ্ছে সমস্ত পরিস্থিতিতেই পতির সেবা করা। বৈদিক সভ্যতায় পুরুষদের জীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষা দেওয়া হত ব্রহ্মচারী হওয়ার, তারপর একজন আদর্শ গৃহস্থ হওয়ার, তারপর বানপ্রস্থ এবং অবশেষে সন্ন্যাসী হওয়ার। আর স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হত, জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পতির অনুগামিনী হওয়ার। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের পর, মানুষ গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করে, এবং স্ত্রীদের পিতামাতারা শিক্ষা দিতেন পতিব্রতা পত্নী হওয়ার। এইভাবে যখন স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হত, তখন তাঁরা উভয়েই উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জীবন যাপন করার শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হত, জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার, এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত, পতির অনুগামিনী হওয়ার। সতী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থ-জীবনে সর্বতোভাবে পতির প্রসন্নতা-বিধান করা, এবং পতি যখন গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনবাসী হতেন, তখন তিনি পতির অনুগামিনী হয়ে, বানপ্রস্থ বা বনবাসীর জীবন গ্রহণ করতেন। সেই অবস্থাতেও গৃহস্থ-আশ্রমে যেভাবে তিনি পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর সেবা করে যেতেন। কিন্তু পতি যখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতেন, তখন পত্নীকে গৃহে ফিরে যেতে হত এবং একজন সাধ্বী রমণীরূপে পুত্র ও পুত্রবধূদের সামনে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শিক্ষা দিতেন, কিভাবে তপশ্চর্যার জীবন যাপন করতে হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পতির গৃহত্যাগের ফলে, তিনিও তপস্বিনীর জীবন যাপন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জপমালায় জপ করতেন, এবং একমালা জপ পূর্ণ করার পর, একদানা চাল একত্র করতেন। এইভাবে যত মালা জপ করতেন, তত দানা চাল সংগ্রহ করে তা রন্ধন করতেন, এবং তা ভগবানকে নিবেদন করে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করতেন। একে বলা হয় তপস্যা। আজও ভারতবর্ষে বিধবারা অথবা যাঁদের পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদিও তাঁদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বাস করেন, তবুও তাঁরা তপস্বিনীর মতো জীবন যাপন করেন। পৃথু মহারাজের পত্নী অর্চি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, এবং তাঁর পতি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও তাঁর অনুগামিনী হয়ে, কেবল বনে ফলমূল খেয়ে এবং ভূমিতে শয়ন করে দিনাতিপাত করেছিলেন। যেহেতু স্ত্রীর শরীর পুরুষদের থেকে অধিক কোমল, তাই মহারাণী অর্চি অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, *পরিকর্শিতা*। কেউ যখন তপস্যা করেন, তখন তাঁর শরীর সাধারণত দুর্বল হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে স্থূল হওয়া ভাল নয়, কারণ আধ্যাত্মিক জীবন অবলম্বন করলে, মানুষের আহার, নিদ্রা ইত্যাদি দেহের সুখ-সুবিধাগুলি হ্রাস করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও মহারাণী অর্চি বনবাসের ফলে অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি অসুখী ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁর মহান পতির সেবা করার সৌভাগ্য উপভোগ করছিলেন।

শ্লোক ২১

দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং
পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী
চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি ॥ ২১ ॥

দেহম্—দেহ; **বিপন্ন**—পূর্ণরূপে রহিত; **অখিল**—সমস্ত; **চেতনা**—অনুভূতি; **আদিকম্**—লক্ষণ; **পত্যুঃ**—তাঁর পতির; **পৃথিব্যাঃ**—পৃথিবীর; **দয়িতস্য**—দয়ালুর; **চ আত্মনঃ**—এবং তাঁর নিজের; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **কিঞ্চিৎ**—অতি অল্প; **চ**—এবং; **বিলপ্য**—বিলাপ করে; **সা**—তিনি; **সতী**—পতিব্রতা; **চিতাম্**—চিতায়; **অথ**—এখন; **আরোপয়ৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **অদ্রি**—পর্বত; **সানুনি**—শিখরে।

অনুবাদ

মহারাণী অর্চি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি, যিনি তাঁর প্রতি এবং সারা পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করছেন না, তখন স্বল্পকাল তিনি বিলাপ করেছিলেন, এবং তারপর এক পর্বত-শিখরে চিতা রচনা করে তাঁর পতির দেহ স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাণী যখন দেখলেন যে, তাঁর পতির দেহে জীবনের সমস্ত লক্ষণ স্তব্ধ হয়েছে, তখন তিনি কিছুকাল বিলাপ করেছিলেন। *কিঞ্চিৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্বল্পকাল'। রাণী পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, তাঁর পতির দেহে জীবনের সমস্ত লক্ষণ—কর্ম, বুদ্ধি ও চেতনা বন্ধ হয়ে গেলেও, তবুও তাঁর মৃত্যু হয়নি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"যেইভাবে এই শরীরে দেহধারী আত্মা নিরন্তর কৌমার থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনই, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি কখনও এই প্রকার পরিবর্তনের ফলে মোহগ্রস্ত হন না।"

জীব যখন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, যাকে সাধারণত মৃত্যু বলা হয়, বুদ্ধিমান মানুষ সেই জন্য অনুশোচনা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে, জীবের মৃত্যু হয়নি, কেবল এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তর হয়েছে। বনে একাকী পতির মৃতদেহ সহ একলা হওয়ার ফলে, মহারাণীর ভয়ভীত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষের মহান পত্নী, তাই তিনি ক্ষণকাল বিলাপ করার পর, বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর করণীয় বহু কর্তব্য রয়েছে। তাই বিলাপ করে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে তিনি একটি পর্বত-শিখরে তাঁর চিতা তৈরি করেছিলেন এবং দাহ করার জন্য তাঁর পতির দেহ তাতে স্থাপন করেছিলেন।

পৃথু মহারাজকে এখানে *দয়িত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি কেবল পৃথিবীর রাজাই ছিলেন না, পৃথিবীকে তাঁর রক্ষিত সন্তানের মতো তিনি পালন করেছিলেন। তেমনই, তিনি তাঁর পত্নীকেও রক্ষা করেছিলেন। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সকলকে রক্ষা করা, বিশেষ করে পৃথিবী বা ভূখণ্ড, যেখানে তিনি শাসন

করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রজা ও পরিবারের সদস্যদেরও। যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা, তাই তিনি সকলকেই সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, তাই এখানে তাঁকে *দয়িত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা
দত্ত্বোদকং ভর্তুরুদারকর্মণঃ ।
নত্বা দিবিস্থাংস্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য
বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্তৃপাদৌ ॥ ২২ ॥

বিধায়—সম্পাদন করে; **কৃত্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **হ্রদিনী**—নদীর জলে; **জল-আপ্লুতা**—পূর্ণরূপে স্নান করে; **দত্ত্বা উদকম্**—জলাঞ্জলি দান করেছিলেন; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতিকে; **উদার-কর্মণঃ**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **দিবিস্থান্**—আকাশে অবস্থিত; **ত্রি-দশান্**—তিন কোটি দেবতাদের; **ত্রিঃ**—তিনবার; **পরীত্য**—পরিক্রমা করে; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বহ্নিম্**—অগ্নিতে; **ধ্যায়তী**—ধ্যান করতে করতে; **ভর্তৃ**—তাঁর পতির; **পাদৌ**—দুটি চরণ-কমল।

অনুবাদ

তারপর মহারাণী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। নদীর জলে স্নান করে, তিনি তাঁর পতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। তারপর আকাশস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে, এবং তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে, তাঁর পতির পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত পতির চিতাগ্নিতে সতী স্ত্রীর প্রবেশকে বলা হয় সহগমন, অর্থাৎ 'পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা'। অনাদিকাল ধরে বৈদিক সভ্যতায় এই সহগমনের প্রথা চলে আসছে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্বকালেও এই প্রথা কঠোরভাবে পালন করা হত। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথাটি বিকৃত হয়ে, এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, মৃত পতির চিতাগ্নিতে পত্নী প্রবেশ করতে না চাইলেও, তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে জোর করে চিতাগ্নিতে প্রবেশ করাত। তাই এই প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু আজও স্বেচ্ছায় পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করার বিরল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ১৯৪০ সালের পরেও একজন সতী স্ত্রীকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে আমরা দেখেছি।

শ্লোক ২৩

বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্ ।
তুষ্টুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩ ॥

বিলোক্য—দেখে; **অনুগতাম্**—মৃত পতির অনুগামিনী হতে; **সাধ্বীম্**—পতিব্রতা স্ত্রী; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজের; **বীর-বরম্**—মহান বীর; **পতিম্**—পতি; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি করেছিলেন; **বর-দাঃ**—বরদানে সমর্থ; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **দেব-পত্ন্যঃ**—দেবতাদের পত্নীগণ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

মহান রাজা পৃথুর পতিব্রতা পত্নী অর্চির এই বীরত্বপূর্ণ কার্য দর্শন করে হাজার হাজার দেবপত্নীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের পতিগণ-সহ রাণীর স্তুতি করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কুর্বত্যঃ কুসুমাসারং তস্মিন্মন্দরসানুনি ।
নদৎস্বমরতূর্যেষু গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ২৪ ॥

কুর্বত্যঃ—বর্ষণ করে; **কুসুম-আসারম্**—পুষ্পবৃষ্টি; **তস্মিন্**—তাতে; **মন্দর**—মন্দর পর্বতের; **সানুনি**—শিখরে; **নদৎসু**—বাজিয়ে; **অমর-তূর্যেষু**—দেবতাদের তূর্য; **গৃণন্তি স্ম**—বলাবলি করেছিলেন; **পরস্পরম্**—নিজেদের মধ্যে।

অনুবাদ

সেই সময় দেবতারা মন্দর পর্বতের শিখরে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীরা সেই চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

দেব্য ঊচুঃ

অহো ইয়ং বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্ ।
সর্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব ॥ ২৫ ॥

দেব্যঃ ঊচুঃ—দেবপত্নীরা বলেছিলেন; **অহো**—আহা; **ইয়ম্**—এই; **বধূঃ**—বধূ; **ধন্যা**—ধন্য; **যা**—যিনি; **চ**—ও; **এবম্**—যেই প্রকার; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভুজাম্**—সমস্ত রাজাদের; **পতিম্**—রাজা; **সর্ব-আত্মনা**—পূর্ণ উপলব্ধি সহকারে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **ভেজে**—আরাধনা করেছেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বধূঃ**—পত্নী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

দেবপত্নীরা বললেন—মহারাণী অর্চি ধন্যা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের সম্রাট মহারাজ পৃথুর এই পত্নী তাঁর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছেন, ঠিক যেভাবে লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যজ্ঞেশং শ্রীর্বধূরিব* বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে, লক্ষ্মীদেবী যেভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন, ঠিক সেইভাবে মহারাণী অর্চি তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। এই পৃথিবীর ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজ্য শাসন করছিলেন, তখন মহারাণী রুক্মিণী, যিনি ছিলেন কৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে প্রধান, তিনি শত-শত দাসী থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। তেমনই বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীও স্বয়ং নারায়ণের সেবা করেন, যদিও ভগবানের সেবা করার জন্য সেখানে হাজার-হাজার ভক্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। এই প্রথা দেবপত্নীরাও অনুসরণ করেন, এবং পুরাকালে মানুষের পত্নীরাও এই আদর্শই অনুসরণ করতেন। বৈদিক সভ্যতায় বিবাহ বিচ্ছেদের মতো মানুষের তৈরি আইনের দ্বারা কখনও পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ হত না। মানব-সমাজে পরিবার-জীবন অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ নামক কৃত্রিম আইন উচ্ছেদ করতে হবে। পতি ও পত্নীকে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করতে হবে, এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা রুক্মিণী-কৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এইভাবে পৃথিবীতে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব।

শ্লোক ২৬

সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্ধ্বমনু বৈণ্যং পতিং সতী ।
পশ্যতাস্মানতীত্যার্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্মণা ॥ ২৬ ॥

সা—তিনি; **এষা**—এই; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রজতি**—গমন করে; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বে; **অনু**—অনুগমন করে; **বৈণ্যম্**—বেণের পুত্র; **পতিম্**—পতি; **সতী**—সতী; **পশ্যত**—দেখে; **অস্মান্**—আমাদের; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **অর্চিঃ**—অর্চি নামক; **দুর্বিভাব্যেন**—অচিন্ত্য; **কর্মণা**—কার্য।

অনুবাদ

দেবপত্নীরা বললেন—দেখ কিভাবে সতী অর্চি তাঁর অচিন্ত্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে, এখনও তাঁর পতির অনুগমন করে, যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঊর্ধ্বগামিনী হচ্ছেন।

তাৎপর্য

যে বিমান পৃথু মহারাজকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যে বিমান মহারাণী অর্চিকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই দুটি বিমানই স্বর্গলোকের দেবীদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেছিল। পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী যে এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা দেখে তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন স্বর্গলোকবাসী দেবতাদের পত্নী এবং পৃথু মহারাজ ছিলেন নিকৃষ্টতর পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও পৃথু মহারাজ তাঁর পত্নীসহ দেবলোক অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন। এখানে *ঊর্ধ্বম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দেবপত্নীরা, যাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তাঁরা ছিলেন চন্দ্র, সূর্য, শুক্র আদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত উচ্চতর লোকের অধিবাসী। ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে হচ্ছে চিদাকাশ, এবং সেই চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। তাই *ঊর্ধ্বম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বৈকুণ্ঠলোক হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে, এবং পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করছিলেন। তা এও ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী অর্চি যখন জড় আগুনের দ্বারা তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁদের চিন্ময় শরীর লাভ করে চিন্ময় বিমানে আরোহণ করেছিলেন, যা জড় উপাদানগুলি অতিক্রম করে চিদাকাশে পৌঁছাতে পারে। যেহেতু তাঁরা দুটি আলাদা বিমানে বাহিত হয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, চিতাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার পরও তাঁরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পৃথক ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা তাঁদের পরিচিতি হারাননি অথবা শূন্য হয়ে যাননি, যা নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করে।

স্বর্গলোকের দেবীরা নিম্ন ও ঊর্ধ্ব দুই দিকই দর্শন করতে পারেন। তাঁরা যখন নীচের দিকে দেখেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের দেহ দগ্ধ হচ্ছে এবং তাঁর পত্নী অর্চি সেই আগুনে প্রবেশ করছেন, এবং যখন তাঁরা উপরের

দিকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, কিভাবে দুটি বিমানে তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁদের *দুর্বিভাব্যেন কর্মণা* বা অচিন্ত্য কর্মের প্রভাবে। পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর পত্নী মহারাণী অর্চি কেবল তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত, এবং তার ফলে তাঁরা অচিন্ত্য কর্মসাধনে সক্ষম ছিলেন। এই প্রকার কার্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ মানুষ ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ পর্যন্ত করতে পারে না, এবং সাধারণ স্ত্রী সতীত্বের এই প্রকার ব্রত অবলম্বন করে সর্বতোভাবে তাঁদের পতির অনুগমন করতে পারে না। মহিলাদের উচ্চ শিক্ষালাভের কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাঁদের পতিরা যদি ভগবদ্ভক্ত হন এবং তাঁরা যদি তাঁদের পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে পতি ও পত্নী উভয়েই মুক্তিলাভ করবেন এবং বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন। পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নীর অচিন্ত্য কর্মের প্রভাবে তা প্রত্যক্ষ হয়েছে।

শ্লোক ২৭

তেষাং দুরাপং কিং ত্বন্যন্মর্ত্যানাং ভগবৎপদম্ ।
ভুবি লোলায়ুষো যে বৈ নৈষ্কর্ম্যং সাধয়ন্ত্যুত ॥ ২৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **কিম্**—কি; **তু**—কিন্তু; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের; **ভগবৎ-পদম্**—ভগবানের রাজ্য; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **লোক**—চঞ্চল; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **যে**—যারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—মুক্তির পথ; **সাধয়ন্তি**—পালন করে; **উত**—সঠিকভাবে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কারণ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পথে অবস্থিত। এই প্রকার ব্যক্তিদের কাছে কোন কিছুই দুর্লভ নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্* । অর্থাৎ, এই জড় জগৎ দুঃখময় (*অসুখম্*) এবং সেই সঙ্গে তা অনিত্য। তাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সেটি হচ্ছে

মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি। যে-সমস্ত ভক্ত নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কেবল জড়-জাগতিক সুখই ভোগ করেন না, তাঁরা সব রকম আধ্যাত্মিক লাভও প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁদের জীবনের শেষে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এই শ্লোকে তাঁদের গন্তব্য স্থলকে *ভগবৎ-পদম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *পদম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ধাম', এবং *ভগবৎ* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের'। অতএব ভগবদ্ভক্তের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ভগবানের ধাম।

এই শ্লোকে *নৈষ্কর্ম্যম্* শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে 'দিব্যজ্ঞান', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে না। সাধারণত জ্ঞান, যোগ ও কর্মের পন্থা জন্ম-জন্মান্তর ধরে সম্পাদন করার পর, ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি করার সুযোগ পাওয়া যায়। সেই সুযোগ লাভ হয় শুদ্ধ ভক্তের কৃপায়, এবং সেভাবেই কেবল প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ করা যায়। এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, দেবপত্নীরা অনুতাপ করেছিলেন, কারণ যদিও তাঁদের উচ্চতর লোকে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে সব রকম জড়সুখ ভোগ করার সুযোগ এসেছিল, তবুও তাঁরা পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নীর মতো সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নী ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন, কারণ তাঁরা যে পদ লাভ করেছিলেন, তার তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—"এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত, সর্বত্রই বার বার জন্ম-মৃত্যুর দুঃখভোগ করতে হয়।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও যায়, তা হলেও তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর কষ্টে ফিরে আসতে হবে। *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে (৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

"এইভাবে স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর, তাদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।" এইভাবে পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, পুনরায় নিম্নতর লোকে ফিরে এসে, পুণ্যকর্মের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে হয়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১২) বলা হয়েছে, *নৈষ্কর্ম্যম্ অপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জিতম্* —"ভগবদ্ভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত, মুক্তির পথ মোটেই নিরাপদ নয়।" কেউ যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতেও

উন্নীত হয়, তবুও তার সেখান থেকে এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকের অতীত ব্রহ্মজ্যোতি থেকেও যদি অধঃপতন হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে যে-সমস্ত সাধারণ যোগী ও কর্মী স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তাদের আর কি কথা? এইভাবে স্বর্গলোকের দেবতাদের পত্নীরা কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফলকে খুব একটা প্রশংসনীয় বলে মনে করেননি।

শ্লোক ২৮

স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি ।
লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে ॥ ২৮ ॥

সঃ—সে; **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়েছে; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-ধ্রুক্**—আত্মদ্রোহী; **কৃচ্ছ্রেণ**—অত্যন্ত ক্লেশের দ্বারা; **মহতা**—মহান কার্যের দ্বারা; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **আপবর্গ্যম্**—মুক্তির পথ; **মানুষ্যম্**—মনুষ্য-জীবনে; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয়ে; **বিষজ্জতে**—যুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে-ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, এই পৃথিবীতে অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেও অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে অবশ্যই আত্মদ্রোহী এবং বঞ্চিত বলে বিবেচনা করতে হবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্বল্প সাফল্য লাভের জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। কর্মীরা অত্যন্ত কঠিন কর্মে ব্যস্ত থাকে, এবং তার ফলে তারা বড় বড় কলকারখানা খোলে, বিশাল নগরী নির্মাণ করে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল যজ্ঞ করছে। তেমনই, যোগীরা সেই একই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কঠোর যোগসাধনা করছে। জ্ঞানীরা জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন। এইভাবে সকলেই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অত্যন্ত কঠিন সমস্ত কার্যে যুক্ত। তাদের সকলকেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কার্যকলাপে যুক্ত বলে মনে করা হয়, কারণ তারা সকলেই জড় জগতে কিছু সুবিধা (অর্থাৎ বিষয়) লাভ করতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কার্যকলাপের ফল অনিত্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, অন্তবৎ তু ফলং

তেষাম্ —"এই ফল (যারা দেবতাদের পূজা করে) সীমিত এবং অনিত্য।" যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীদের কার্যকলাপের ফল ক্ষণস্থায়ী। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্* —"তা কেবল অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য।" বিষয় বলতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ বোঝায়। কর্মীরা সোজাসুজিভাবে বলে যে, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। যোগীরাও ইন্দ্রিয়সুখ চায়, তবে তারা তা চায় উচ্চ স্তরে। তারা যোগ অভ্যাস করে নানা রকম অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে চায়। তাই তারা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা মহৎ থেকে মহত্তর হওয়া, অথবা পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ সৃষ্টি করা, কিংবা বৈজ্ঞানিকদের মতো নানা রকম আশ্চর্যজনক যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য অত্যন্ত কঠোর সাধনা করে। তেমনই, জ্ঞানীরাও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত, কারণ তারা চায় ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে। এইভাবে এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অথবা নিম্ন স্তরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন। ভক্তেরা কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী নন; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করেই সন্তুষ্ট। যেহেতু তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাই তাঁদের অপ্রাপ্য কিছুই নেই, কারণ তাঁরা ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত।

দেবপত্নীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রয়াসীদের *বঞ্চিত* বলে নিন্দা করেছেন। যারা সেই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের হত্যা করছে (*আত্মহা*)। যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/১৭) বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

কেউ যখন বিশাল সাগর উত্তীর্ণ হতে চায়, তখন তার একটি সুদৃঢ় নৌকার প্রয়োজন হয়। কথিত হয় যে, অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করার জন্য, এই মনুষ্য-শরীর হচ্ছে একটি অতি সুন্দর নৌকা। মনুষ্য-শরীরে গুরুরূপ অতি সুদক্ষ কর্ণধারের সাহায্য লাভ করা যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপ অনুকূল বায়ুও পাওয়া যায়। সেই অনুকূল বায়ু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। মনুষ্য-শরীর হচ্ছে নৌকা, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হচ্ছে অনুকূল বায়ু, এবং শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কর্ণধার। শ্রীগুরুদেব জানেন কিভাবে পাল খাটাতে হবে, যার ফলে অনুকূল বায়ুর সুযোগ নেওয়া যায় এবং তিনি সেই নৌকার হাল ধরে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যান। কিন্তু কেউ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে সে এই মনুষ্য-জীবন বৃথা নষ্ট করছে। এইভাবে সময় ও জীবনের অপচয় করা আত্মহত্যা করারই সামিল।

এই শ্লোকে *লব্ধাপবর্গ্যম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *অপবর্গ্যম্* বা মুক্তির পথ নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়া নয়, পক্ষান্তরে সালোক্যাদি-সিদ্ধি লাভ করা, যার অর্থ হচ্ছে সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া যেখানে ভগবান বাস করেন। পাঁচ প্রকার মুক্তি রয়েছে, এবং তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাযুজ্য-মুক্তি, বা পরমেশ্বরে বা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু, যেহেতু ব্রহ্মজ্যোতি থেকে জড় জগতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই শ্রীল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। *স বঞ্চিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মনুষ্য-জীবন লাভ করার পরেও কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি না করে, তা হলে সে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত হয়েছে। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়, সেই সমস্ত অভক্তদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা ছাড়া মনুষ্য জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

স্তুবতীষ্বমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধূঃ ।
যং বা আত্মবিদাং ধুর্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **স্তুবতীষু**—স্তব করে; **অমর-স্ত্রীষু**—স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা; **পতি-লোকম্**—যে গ্রহলোকে তাঁর পতি গমন করেছেন; **গতা**—পৌঁছে; **বধূঃ**—পত্নী; **যম্**—যেখানে; **বা**—অথবা; **আত্ম-বিদাম্**—স্বরূপসিদ্ধ জীবদের; **ধুর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র (পৃথু মহারাজ); **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অচ্যুত-আশ্রয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করছিলেন, তখন মহারাণী অর্চি সেই লোকে পৌঁছেছিলেন, যে-লোকটি স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর পতি পৃথু মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, কোন স্ত্রী যখন তাঁর পতির সহমৃতা হন বা পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পতি যে-লোকে গমন করেন, তিনিও সেই লোক প্রাপ্ত

হন। এই জড় জগতে পতিলোক বলে একটি লোক রয়েছে, ঠিক যেমন পিতৃলোক নামক একটি লোক রয়েছে। কিন্তু এই শ্লোকে *পতিলোক* শব্দটি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানকে বোঝানো হয়নি, কারণ পৃথু মহারাজ স্বরূপসিদ্ধ জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার ফলে, নিশ্চয়ই ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাণী অর্চিও পতিলোকে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু এই লোকটি জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন গ্রহলোক নয়, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই লোকে প্রবেশ করেছিলেন, যা তাঁর পতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জড় জগতেও পত্নী যখন পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন, তার পরবর্তী জন্মে তিনি তাঁর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। তেমনই, মহারাজ পৃথু ও মহারাণী অর্চি বৈকুণ্ঠলোকে মিলিত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকে পতি-পত্নী রয়েছেন, তবে সেখানে যৌনজীবন বা সন্তান উৎপাদনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বৈকুণ্ঠলোকে পতি ও পত্নী উভয়েই অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত, এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু সেখানে তাঁরা যৌনসুখ উপভোগ করেন না। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের কাছে যৌনসঙ্গম মোটেই সুখকর নয়, কারণ তাঁরা উভয়েই ভগবানের মহিমা কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছেন যে, এই জড় জগতে থাকা কালেও, পতি ও পত্নী তাঁদের গৃহকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারেন। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলে, এই জগতেও পতি ও পত্নী গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীবিগ্রহের সেবা করে বৈকুণ্ঠে বাস করতে পারেন। তার ফলে তাঁরা কখনও যৌন আবেগ অনুভব করবেন না। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার পরীক্ষা। যিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি লাভ করেছেন, তিনি কখনও যৌন-জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ বোধ করেন না, এবং তিনি যে পরিমাণে যৌন-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন, সেই অনুপাতে তিনি ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে বাস করছেন বলে অনুভব করেন। চরম বিচারে জড় জগৎ বলে কিছু নেই, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবা বিস্মৃত হয়ে তার ইন্দ্রিয়ের সেবায় যুক্ত হয়, তখনই কেবল তার মনে হয় যে, সে জড় জগতে বাস করছে।

শ্লোক ৩০

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ ।
কীর্তিতং তস্য চরিতমুদ্দামচরিতস্য তে ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্-ভূত—এইভাবে; **অনুভাবঃ**—অত্যন্ত মহান, শক্তিমান; **অসৌ**—তা; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; —তিনি; **ভগবৎ-তমঃ**—প্রভুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **কীর্তিতম্**—বর্ণিত;

তস্য—তাঁর; **চরিতম্**—চরিত্র; **উদ্দাম**—অত্যন্ত মহান; **চরিতস্য**—যিনি এই সমস্ত গুণসমন্বিত; **তে**—তোমার কাছে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান, এবং তাঁর চরিত্র ছিল উদার, চমৎকার ও মহৎ। তাই আমি তাঁর কথা তোমার কাছে যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবত্তমঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ *ভগবৎ* শব্দটি বিশেষভাবে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। *ভগবান্* শব্দটি আসছে ভগবৎ শব্দটি থেকে। কিন্তু কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবান্* শব্দটি ব্রহ্মা, শিব, নারদ মুনি প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। পৃথু মহারাজের ক্ষেত্রেও সেইভাবে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। এখানে তাঁকে *ভগবত্তমঃ* বা ভগবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যখন অসাধারণ ও অলৌকিক গুণাবলী প্রদর্শন করেন, অথবা তিরোভাবের পর উচ্চতম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন অথবা জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য জানেন, তখনই কেবল তাঁকে *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কখনও *ভগবান্* শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

য ইদং সুমহৎপুণ্যং শ্রদ্ধয়াবহিতঃ পঠেৎ ।
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পৃথোঃ পদবীমিয়াৎ ॥ ৩১ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত মহান; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **পঠেৎ**—পাঠ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—ব্যাখ্যা করেন; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **বা**—অথবা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **পদবীম্**—পদ; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পৃথু মহারাজের মহান চরিত্র শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে

পৃথু মহারাজের লোক প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ, তিনিও ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। আমরা যখন বিষ্ণুর কথা বলি, তখন আমরা বিষ্ণুর সঙ্গে যা সম্পর্কিত, তাকেও উল্লেখ করি। *শিব পুরাণে* শিব বলেছেন যে, বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, বৈষ্ণব অথবা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যা তাঁর আরাধনা। সেই তত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বৈষ্ণবের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ-কীর্তনেরই সমান, কারণ মৈত্রেয় ঋষি এখানে বলেছেন যে, যাঁরা মনোযোগ সহকারে পৃথু মহারাজের মহিমা শ্রবণ করেন, তাঁরাও সেই গ্রহলোক প্রাপ্ত হবেন, যেই গ্রহলোকে পৃথু মহারাজ গিয়েছেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই। তাকে বলা হয় অদ্বয়জ্ঞান। বৈষ্ণব বিষ্ণুরই মতো মহত্ত্বপূর্ণ, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর *গুর্বষ্টকে* লিখেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"শ্রীগুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো সম্মান করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক। সেই কথা সমস্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে এবং সমস্ত মহাজনেরা তা অনুসরণ করেছেন। তাই, শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি হচ্ছেন শ্রীহরির আদর্শ প্রতিনিধি।"

পরম বৈষ্ণব হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব, এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। বলা হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও গোপীদের নাম কীর্তন করতেন। তাঁর কয়েকজন ছাত্র তখন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিল, গোপীদের নাম কীর্তন করার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিরোধ এমনই একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। কারণ তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন বলে, তাঁকে তারা খুব গুরুত্ব দিচ্ছিল না। আসল কথাটি হচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু গোপীদের নাম কীর্তন করেছিলেন, অতএব

গোপীদের বা ভগবানের ভক্তদের পূজা ভগবানের পূজারই সমান। ভগবান নিজেও বলেছেন যে, সরাসরিভাবে তাঁর ভক্তি করার থেকে তাঁর ভক্তের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কখনও কখনও সহজিয়ারা ভগবানের ভক্তদের কার্যকলাপের কথা বাদ দিয়ে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে আগ্রহ প্রদর্শন করে। এরা উচ্চস্তরের ভক্ত নয়, যাঁরা ভক্ত ও ভগবানকে সমান স্তরে দর্শন করেন, তাঁরা উন্নততর স্তরের ভক্ত।

শ্লোক ৩২

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ ।
বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম-বর্চস্বী**—যিনি আধ্যাত্মিক সাফল্যের শক্তিলাভ করেছেন; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়বর্ণ; **জগতী-পতিঃ**—পৃথিবীর রাজা; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ; **পঠন্**—পাঠ করে; **বিট্-পতিঃ**—পশুদের প্রভু; **স্যাৎ**—হন; **শূদ্রঃ**—শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ; **সত্তম-তাম্**—মহান ভক্তের পদ; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় সারা পৃথিবীর রাজা হন; বৈশ্য অন্য বৈশ্য ও পশুদের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন, এবং শূদ্র শ্রেষ্ঠ ভক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেরই ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত। তিনি সমস্ত কামনা-রহিত (*অকাম*) হন, সকাম হন, কিংবা মুক্তি লাভের অভিলাষী (*মোক্ষকাম*) হন, সকলকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের আরাধনা করতে এবং প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে। তা করার ফলে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা, বিশেষ করে শ্রবণ ও কীর্তন এতই শক্তিশালী যে, তা মানুষকে পরম পূর্ণতা প্রদান করতে পারে। এই শ্লোকে *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* ও *শূদ্রদের* উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এখানে বুঝতে হবে যে, *ব্রাহ্মণ* বলতে যাদের ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম হয়েছে, *ক্ষত্রিয়* বলতে যাদের ক্ষত্রিয়-পরিবারে জন্ম হয়েছে, *বৈশ্য* বলতে যাদের বৈশ্য-পরিবারে জন্ম হয়েছে এবং *শূদ্র* বলতে যাদের শূদ্র-পরিবারে জন্ম হয়েছে, তাঁদের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* অথবা *শূদ্র* নির্বিশেষে সকলেই কেবলমাত্র শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই চরম লক্ষ্য নয়; ব্রাহ্মণের শক্তি, যাকে বলা হয় ব্রহ্মতেজ, তা থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, ক্ষত্রিয়-পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য নয়, পৃথিবীর উপর শাসন করার ক্ষমতা থাকা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই, বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়; তার কাছে হাজার হাজার পশু (বিশেষ করে গাভী) থাকা উচিত এবং অন্য বৈশ্যদের উপর আধিপত্য থাকা উচিত, ঠিক যেমন বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের ছিল। নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য এবং তাঁর নয় লক্ষ গাভী ছিল, এবং তিনি বহু গোপ ও গোপবালকদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার মাধ্যমে এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার মাধ্যমে, ব্রাহ্মণের থেকেও মহৎ হতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিঃ কৃত্ব ইদমাকর্ণ্য নরো নার্যথবাদৃতা ।
অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্ধনো ধনবত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিঃ—তিনবার; **কৃত্বঃ**—উচ্চারণ করে; **ইদম্**—এই; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরঃ**—মানুষ; **নারী**—স্ত্রী; **অথবা**—অথবা; **আদৃতা**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **অপ্রজঃ**—সন্তানহীন; **সু-প্রজ-তমঃ**—বহু সন্তান লাভ করতে পারেন; **নির্ধনঃ**—ধনহীন; **ধন-বৎ**—ধনী; **তমঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পৃথু মহারাজের এই কাহিনী শ্রবণ করলে পুত্রহীন বহু পুত্রলাভ করবেন, এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠ হবেন।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষেরা ধনসম্পদ ও বৃহৎ পরিবার লাভের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে, বিশেষ করে দুর্গাদেবী, শিব ও ব্রহ্মার। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় *শ্রিয়ৈশ্বর্য-প্রজেপ্সবঃ* । *শ্রী* মানে 'সৌন্দর্য', *ঐশ্বর্য* মানে 'ধনসম্পদ', *প্রজা* মানে 'সন্তান-সন্ততি', এবং *ঈপ্সবঃ* মানে 'আকাঙ্ক্ষী'। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার বরলাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতে হয়। কিন্তু এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র শ্রবণ করার ফলে, প্রচুর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করা

যায়। কেবলমাত্র পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ, জীবনী ও ইতিহাস পাঠ করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্তত তিনবার তা পাঠ করা উচিত। যারা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, তারা পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তদের কথা শ্রবণ করে এতই লাভবান হবেন যে, তাদের আর অন্য কোন দেবতাদের কাছে যেতে হবে না। এই শ্লোকে *সুপ্রজতমঃ* ('বহু সন্তান-সন্ততি পরিবৃত হয়ে') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কারও বহু সন্তান-সন্ততি থাকতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও উপযুক্ত সন্তান নাও হতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে *সুপ্রজতমঃ*, অর্থাৎ এইভাবে লব্ধ সমস্ত সন্তানেরা বিদ্যা, ঐশ্বর্য, শ্রী ও শক্তি ইত্যাদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত হবে।

শ্লোক ৩৪

অস্পষ্টকীর্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ।
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুংসামমঙ্গল্যনিবারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অস্পষ্ট-কীর্তিঃ—অপ্রকাশিত যশ; **সু-যশাঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **মূর্খঃ**—নিরক্ষর; **ভবতি**—হয়; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান; **ইদম্**—এই; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলজনক; **পুংসাম্**—মানুষদের; **অমঙ্গল্য**—অমঙ্গল; **নিবারণম্**—নাশ করে।

অনুবাদ

এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করলে, যশহীন ব্যক্তি অত্যন্ত যশস্বী হবেন, এবং মূর্খ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ, পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত এতই মঙ্গলজনক যে, তা সমস্ত অমঙ্গল দূর করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই কিছু লাভ, কিছু পূজা এবং কিছু প্রতিষ্ঠা চায়। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে, অনায়াসে সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়। এমন কি কেউ যদি সমাজে অপরিচিত অথবা অখ্যাত হন, তিনিও যদি ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেন এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তা হলে তিনি অত্যন্ত যশস্বী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। কেউ যদি মূর্খ হন, তবুও কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতায়* ভগবান ও তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করেন, তা হলে তিনিও সমাজে মহাপণ্ডিত বলে পরিচিত হতে পারেন। এই জড় জগতে প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদে পূর্ণ, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে

নির্ভীক, কারণ ভগবদ্ভক্তি এতই মঙ্গলজনক যে, তা আপনা থেকেই সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করে। যেহেতু পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ, তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়।

শ্লোক ৩৫

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং কলিমলাপহম্ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্‌সিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ।
শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুর্ণাং কারণং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ধন্যম্—ধনপ্রাপক; **যশস্যম্**—যশের উৎস; **আয়ুষ্যম্**—দীর্ঘ আয়ুর উৎস; **স্বর্গ্যম্**—স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার উপায়-স্বরূপ; **কলি**—কলিযুগের; **মল-অপহম্**—কল্মষ নাশকারী; **ধর্ম**—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; **মোক্ষাণাম্**—মুক্তির; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অভীপ্সুভিঃ**—অভিলাষী; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **এতৎ**—এই বর্ণনা; **অনুশ্রাব্যম্**—শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য; **চতুর্ণাম্**—চারটির; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—চরম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ মহান হতে পারে, আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে, স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং কলিযুগের কলুষ নাশ করতে পারে। অধিকন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথেও উন্নতিসাধন করতে পারে। অতএব, এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়, এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর সমস্ত জড় বাসনা আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত (*অকাম*) হতে চান, অথবা জড়-জাগতিক উন্নতিসাধন করতে চান (*সকাম* বা

সর্বকাম), অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান (*মোক্ষকাম*), তিনি যেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তের মহিমা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন। সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের জানা। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন তাঁর ভক্তদের কথাও বলি, কারণ তিনি কখনও একলা থাকেন না। তিনি কখনও নির্বিশেষ অথবা শূন্য নন। শ্রীকৃষ্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উপস্থিত থাকেন, সেই স্থান শূন্য হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৩৬

বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রুত্বৈতদভিযাতি যান্ ।
বলিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥ ৩৬ ॥

বিজয়-অভিমুখঃ—জয়লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে উদ্যত; **রাজা**—রাজা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **অভিযাতি**—যাত্রা করেন; **যান্**—রথে; **বলিম্**—কর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **হরন্তি**—উপহার দেন; **অগ্রে**—সম্মুখে; **রাজানঃ**—অন্য রাজারা; **পৃথবে**—পৃথু মহারাজকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শাসন-ক্ষমতা ও জয়লাভে ইচ্ছুক কোনও রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী তিনবার উচ্চারণ করে তাঁর রথে চড়ে যাত্রা করেন, তা হলে তাঁর আদেশে অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কর প্রদান করবেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পৃথু মহারাজকে তাঁর আদেশ মাত্রই কর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজা যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে চান, তাই তিনি অন্য সমস্ত রাজাদের তাঁর অধীনস্থ করতে চান। বহুকাল পূর্বে পৃথু মহারাজ যখন পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছিলেন, তখনও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। এমন কি পাঁচ হাজার বছর আগেও যুধিষ্ঠির মহারাজ ও পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। কখনও কখনও অধীন রাজারা বিদ্রোহ করে, এবং তখন সম্রাটকে তাঁদের দণ্ডদান

করতে হয়। কেউ যদি অন্য সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে সমগ্র পৃথিবী শাসন করার অভিলাষী হন, তা হলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র কীর্তন করেন।

শ্লোক ৩৭

মুক্তান্যসঙ্গো ভগবত্যমলাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
বৈণ্যস্য চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েৎপঠেৎ ॥ ৩৭ ॥

মুক্ত-অন্য-সঙ্গঃ—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অমলাম্**—নির্মল; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদ্বহন্**—সম্পাদন করে; **বৈণ্যস্য**—মহারাজ বেণের পুত্র; **চরিতম্**—চরিত্র; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করা; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যদের শোনানো অবশ্য কর্তব্য; **পঠেৎ**—এবং পাঠ করেন।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির বিবিধ পন্থা পালন করে চিন্ময় পদে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারেন, তবুও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময়, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

এক প্রকার কনিষ্ঠ ভক্ত আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করতে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রাসলীলার বর্ণনাকারী অধ্যায়গুলি শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎসুক। এই প্রকার ভক্তদের এই উপদেশের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস অভিন্ন। একজন আদর্শ রাজারূপে, পৃথু মহারাজ প্রজা-শাসনের সমস্ত যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে তাদের শিক্ষাদান করতে হয়, কিভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে হয়, কিভাবে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, এবং কিভাবে মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়, ইত্যাদি। তাই সহজিয়া বা কনিষ্ঠ ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং অন্যদের শ্রবণ করান, যদিও তিনি মনে করতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চ স্তরে চিন্ময় পদে তিনি অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩৮

বৈচিত্রবীর্যাভিহিতং মহন্মাহাত্ম্যসূচকম্ ।
অস্মিন্ কৃতমতির্মর্ত্যম্ পার্থবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

বৈচিত্রবীর্য—হে বিচিত্রবীর্যের পুত্র (বিদুর); **অভিহিতম্**—কীর্তিত; **মহৎ**—মহান; **মাহাত্ম্য**—মহিমা; **সূচকম্**—প্রকাশকারী; **অস্মিন্**—এতে; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **অতি-মর্ত্যম্**—অসাধারণ; **পার্থবীম্**—পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে; **গতিম্**—উন্নতি, লক্ষ্য; **আপ্নুয়াৎ**—প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! আমি যথাসাধ্য পৃথু মহারাজের চরিত্র কীর্তন করলাম, যা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করে। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, তিনিও পৃথু মহারাজের মতো ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে *শ্রাবয়েৎ* শব্দটির উল্লেখ হয়েছে, তা ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজের চরিত্র কেবল নিজেই পাঠ করা উচিত, তাই নয়, অন্যদেরও তা শোনানো উচিত। তাকে বলা হয় প্রচার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন—*"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ"* (*শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। পৃথু মহারাজের ভগবদ্ভক্তির ইতিহাস পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনার মতোই শক্তিশালী। ভগবানের লীলা এবং পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করা উচিত নয়, এবং ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে যখনই সম্ভব অন্যদের পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা। কেবল নিজের হিত সাধনের জন্য তাঁর লীলা পাঠ করা উচিত, তাই নয়, অন্যদেরও তা পাঠ করতে এবং শ্রবণ করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। এইভাবে সকলেই লাভবান হবে।

শ্লোক ৩৯

অনুদিনমিদমাদরেণ শৃণ্বন্
পৃথুচরিতং প্রথয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ ।
ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে
স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

অনু-দিনম্—প্রতিদিন; **ইদম্**—এই; **আদরেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **পৃথু-চরিতম্**—পৃথু মহারাজের বর্ণনা; **প্রথয়ন্**—কীর্তন করে; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভব-সিন্ধু**—অজ্ঞানের সমুদ্র; **পোত**—নৌকা; **পাদে**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **নিপুণাম্**—পূর্ণ; **লভতে**—লাভ করেন; **রতিম্**—আসক্তি; **মনুষ্যঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নিশ্চিতভাবে বর্ধিত হবে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার তরণিসদৃশ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভবসিন্ধু-পোত-পাদে* বাক্যাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে বলা হয় *মহৎ-পদম্;* অর্থাৎ, সমগ্র জড় জগতের উৎস হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —সব কিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই জড় জগৎ, যার তুলনা অজ্ঞানের সমুদ্রের সঙ্গে করা হয়, তাও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। কিন্তু অজ্ঞানের এই মহাসমুদ্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায়। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে আর এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থিত হওয়ার ফলে, তা উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। ভগবান ও ভগবানের ভক্তের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়রূপে স্থির হওয়া যায়। পৃথু মহারাজের জীবন-চরিত নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বর্ণনা করার ফলে, অনায়াসে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে *বিমুক্ত-সঙ্গঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ করি, তাই এই জড় জগতে আমাদের স্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু যখন আমরা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হই, তৎক্ষণাৎ আমরা *বিমুক্ত-সঙ্গ* হই অথবা মুক্ত হয়ে যাই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।